সংগ্রাম থেকে ঐতিহ্যে : তীজন বাঈ

অনুশ্রী রায়
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর,
বাংলা সাহিত্য ও নাট্য গবেষক
Email: anushriroy1993@gmail.com

সারসংক্ষেপ :

এক আদিবাসী, নিম্নবর্গের মহিলা আদর্শ রক্ষার জন্য সারা জীবন লড়াই করেছেন। পুরুষতন্ত্রের অপমানের ঘেরাটোপ ভেঙে নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। টিপ ছাপ দেওয়া আঙুল স্পর্শ করেছে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ সব সম্মান। আজ 'পাণ্ডবাণী' মানেই তীজন বাঈ। মহাভারতের কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছত্তিশগঢ়ের এই অভিনব লোকনাট্য আঙ্গিককে নতুন রূপদান করেছেন তিনি। জাত-পাত, ব্রাহ্মণ্য সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বারবার গর্জে উঠেছে তাঁর মহাকাব্যিক স্বর।

সূচক শব্দবন্ধ :

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পাণ্ডবাণী, পুরুষতান্ত্রিকতা, লড়াই, প্রতিষ্ঠা।

সংগ্রাম থেকে ঐতিহ্যে : তীজন বাঈ

মাটির দেওয়াল, গাছের ডালপালা, পাতা, খড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একটি ঝুপড়ি। আলো-বাতাসেরও যেন প্রবেশ নিষেধ সেখানে - ১৯৫৬ সালের ২৪ এপ্রিল (মতান্তরে ৮ই অগাস্ট) এই ঘরেই কেঁদে উঠেছিল এক নবজাত শিশুকণ্ঠ। নতুন প্রাণের আগমনে পিতা-মাতার মন সেদিন আনন্দে ভরে ওঠেনি বরং তাদের গ্রাস করেছিল প্রবল দুশ্চিন্তা যে, কি খাওয়াবেন শিশুটিকে। চরম দরিদ্র ঘরে সেদিন জন্ম নিয়েছিল এক বিস্ময়কর প্রতিভা - তীজন বাঈ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ কখনো পান নি। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে বড় তীজন ঘরের কাজ, ভাইবোনদের দেখাশোনা, বান্ধবীদের সঙ্গে খেলা - এই নিয়েই বাল্য থেকে কৈশোরে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁদের 'পারধি' সমাজে লেখাপড়ার চল বিশেষ ছিল না, মেয়েদের জন্য তো একদমই নয়। ফলে অক্ষর পরিচয় ঘটে না উঠলেও মা সরস্বতীর বরপুত্রী ছিলেন তিনি। 'ঘরের শঙ্খ' তাঁর জন্য বেজে ওঠেনি কিন্তু তাঁর জন্মলগ্নে ঈশ্বরের অসীম কৃপা বর্ষিত হয়েছিল। মনে পড়ে যায় 'মুক্তধারা'র পথপ্রদর্শক অভিজিতের নিজস্ব অনুভবের প্রকাশ - ''যেসব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি - দূরকে নিকট করার পথ''।[১] দুটি জীবনের প্রেক্ষাপট আলাদা কিন্তু লক্ষ্য এক। প্রকৃতির বাঁধন কাটতে জীবন ভাসিয়ে দেওয়া অভিজিৎ আর মানুষের সংকীর্ণতর মন ও সমাজের শাসনের গণ্ডি কেটে পথ তৈরি করা তীজন বাঈ আমাদের চোখে এক হয়ে যান। নিজস্ব পরম্পরা

ও ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে গর্বিত করে তুলে নতুন পথই তো প্রস্তুত করে দিয়েছেন তিনি, যে পথ ধরে বাধাহীন ভাবে আরও বহু তীজন এগিয়ে আসবে। ঐতিহ্য রক্ষণের পতাকাটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগিয়ে যেতে থাকবে।

আজ তীজন বাঈ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এই সফর কিন্তু খুব মসৃণ ছিল না বরং দুঃসাধ্য, কঠোরই ছিল। তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের দুর্গ্ জেলার গনিয়ারী গ্রামের যে পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন তাদের ও তাদের গোষ্ঠীর সকলেরই পেশা ছিল চাটাই, ঝাঁটা ইত্যাদি বানানো, মধু সংগ্রহ, পাখি ধরা। একেবারেই নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা ছিল কমবেশি সকলেরই। ছেঁড়া, তালি দেওয়া একই জামাকাপড়ে তীজনের মাস কেটে যেত। দারিদ্র্যকে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলা জীবনেই একদিন বাঁকবদল ঘটে। ছত্তিশগঢ় তখনো পৃথক রাজ্য হয়নি। ছত্তিশগঢ়ী ভাষাই তীজনের মাতৃভাষা। এই ভাষার ঐতিহ্যশালী এক লোকনাট্য ও লোকসঙ্গীত-প্রধান আঙ্গিক হল 'পাণ্ডবাণী'। ছত্তিশগঢ়ী ভাষায় যার অর্থ 'পাণ্ডবদের কথা বা বাণী'। এই লোকশৈলী সমগ্র ছত্তিশগঢ় জুড়েই পুরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হতো। নারীদের অংশগ্রহণ ছিল কেবলমাত্র শ্রোতা-দর্শক রূপে, প্রত্যক্ষ শিল্পী রূপে নয়। কিন্তু তীজন বাঈ সৃষ্টি করলেন এক ইতিহাস। আজ সারা পৃথিবী জুড়েই পাণ্ডবাণীর সমার্থক তীজন বাঈ। বিস্ময়কর, কুর্নিশযোগ্য তাঁর এই যাত্রাপথ। অক্ষরজ্ঞানহীন এই আদিবাসী মহিলা সকলের কাছেই এক সুবৃহৎ প্রেরণা। নিজের সিদ্ধান্ত, নিজের শৈল্পিক ইচ্ছাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে দৃঢ় ভাবে সমাজ-সংসারের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হলেন তীজন বাঈ।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দমনমূলক মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া জাতপাতের ছুঁৎমার্গ তীজনের জীবনে প্রভাব ফেলতে থাকে শৈশব থেকেই। পিতা চুনুকলাল ও মাতা সুখবতী পারধি ছিলেন এই নিষ্ঠুর সমাজের শিকার। ফলে তাঁরা কোনদিন তীজনকে সমর্থন করেননি। উপরন্তু প্রবল মারতেন, বিশেষত মা। তীজনের এগারো বছর বয়সী জীবনে হঠাৎ এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। সুখবতী দেবীর কাকা ব্রিজলাল পারধি ছিলেন পাণ্ডবাণী শিল্পী। তীজনদের ঝোপড়ার অনতিদূরেই তিনি থাকতেন। একদিন বালিকা তীজন তার ঝোপড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলেন অসাধারণ এক সাঙ্গীতিক কথকতা - 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্ব'। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলেন সম্পূর্ণ পর্বটি কিন্তু অচিরেই ধরা পড়ে গেলেন দাদুর কাছে। দাদু সম্পূর্ণ বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি ভয়ে এক সপ্তাহ ধরে শোনা পালা মাত্র দশ মিনিটে শুনিয়ে দেন। তার দাদু অভিভূত হয়ে পড়েন, চোখ ভেসে যায় কান্নায়। তিনি বলে ওঠেন যে, তার ঘরে থাকা এই রত্নকে তিনি চিনতেই পারেন নি। তারপর শুরু হয় বাড়ির লোককে লুকিয়ে রাতে পাণ্ডবাণী শেখা। দাদু এক-একটা পর্ব প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা করে শোনাতেন। শিক্ষার প্রথম দিনেই শুনিয়েছিলেন আদিপর্ব থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব। ছোট্ট তীজন এতসব বুঝে উঠতে পারেন নি, সহজ-সরল ভাবে দাদু বুঝিয়েছিলেন যে, আদি অর্থাৎ জীবন এবং স্বর্গ অর্থাৎ মৃত্যু। এভাবেই সম্পূর্ণ নিরক্ষর তীজনের কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ হয়ে ওঠে সমগ্র মহাভারত। কিন্তু ঝড় একদিন ওঠে। আধুনিক জীবন থেকে শত হাত দূরে-থাকা (যদিও তখন আধুনিকতা সমাজকে এত প্রবল ভাবে জড়িয়ে ধরেনি) এই আদিবাসী গ্রামের রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে যখন তীজনের সুরেলা দৃঢ় কণ্ঠ মুখরিত হল, গোঁড়া সমাজের অন্ধ অহং জেগে উঠল। কুৎসা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নামে, তাঁর

মায়ের চরিত্রের দিকেও উঠল আঙুল। তাঁর দাদু হলেন অপমানিত। এই অপবাদ, যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতেন না তাঁর মা। ছোট্ট তীজনকে তিনি ভীষণ মারতেন, ঘরে আটকে রাখতেন খাবার না দিয়ে। একবার তাঁর গলাও টিপে ধরেছিলেন। তাঁর বাবা কখনো তাঁকে মারেন নি ঠিকই কিন্তু কোনদিন এসবের প্রতিবাদও করেন নি বা তাঁকে সমর্থন সূচক ইঙ্গিতও দেন নি।

শুধু মেয়ে বলে তাঁর শিল্পীসত্তাকে গলা টিপে মারার নানা রকম প্রয়াস এভাবেই চলতে থাকে। নিজের সিদ্ধান্তে তিনিও দৃঢ় হতে থাকেন। তাঁর বারবার মনে হতো যে ভগবানের কথকতাতে দোষ কোথায়। ঈশ্বর যখন নিজের মহিমা কীর্তনের ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দিয়েছেন তখন তিনি তা পালন করবেন জীবন বাজি রেখে। হয় পাণ্ডবাণী, নয় মৃত্যু। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, যদি পাণ্ডবাণী না থাকতো তাহলে তীজনও থাকতো না, মরে যেত। তাঁর গতিরোধের জন্য বারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। চিরজীবন নারীদের স্বপ্নপূরণের পথ আটকানোর এটাই তো সহজ উপায়। স্বামী, শ্বশুরবাড়ির লোকদেরও একেবারে অপছন্দ ছিল তীজনের এই ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা। কিন্তু তিনি তো হার না মানার পণ করেছেন। একদিন গ্রামেরই এক পাণ্ডবাণীর আসরে তিনি পরিবেশন করেছিলেন ভীমের একটি 'প্রসঙ্গ' (পাণ্ডবাণীতে এক একটি ঘটনাকে 'প্রসঙ্গ' বলা হয়)। তাঁর স্বামী সেখানে তাঁকে বাধা দেন, এমনকি জনসমক্ষে মারতেও যান কিন্তু তীজন তাঁর হাতে থাকা তানপুরাকেই ভীমের গদার মতো ব্যবহার করে স্বামীকে প্রহার করেন। এরপর স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন। তাঁদের 'পারধি' সমাজও তাঁকে বহিষ্কার করে। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কর্মঠ তীজন নিজেই বানিয়ে নেন এক ঝোপড়া, নগণ্য সহৃদয় প্রতিবেশীদের সাহায্য পান। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তীজন হৃদয় দিয়ে আগলে রাখেন তাঁর জীয়নকাঠি পাণ্ডবাণীকে।[২] পরবর্তীকালে তিনি আরো চারবার বিবাহ করেন। বর্তমান স্বামী ব্যতীত বাকি স্বামীরা কোনদিন তাঁকে বোঝেননি, এমনকি রোজ কপালে জুটতো মার। এক নারী হয়ে তাঁর জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতেন সমাজে অপর নারীদের যন্ত্রণাময় অবস্থান। মহাভারতের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' প্রসঙ্গ তাই তাঁর ভীষণ প্রিয়। মহাভারতীয় সমাজের সঙ্গে সমকালকে মিলিয়ে দিয়ে নারীর অবমাননায় গর্জে ওঠে তীজনের স্বর, মনে করিয়ে দেয় অনাচারী কৌরবদের করুণ পরিণতি। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন মধ্যম পাণ্ডব ভীমের তেজ।

তথাকথিত যে 'স্টেজ পারফর্ম্যান্স', তার সঠিক দিনক্ষণ পাওয়া না গেলেও তীজন তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি সন্ধান করে জানান যে, দুর্গ্ জেলার 'চন্দখুরী' গ্রামেই তিনি প্রথম মঞ্চে উপস্থাপন করেন এই শৈলী। তিনি একবার অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই মতো দৈহিক পরিশ্রম করে পেট চালানো একটি দলের গরুর গাড়ির পিছনে খালি পায়ে ছুটেছিলেন। তারা তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যায়। এই চন্দখুরী গ্রামের স্কুল মেরামতির কাজ করছিল এরা। তীজনও তাদের সঙ্গে কাজে লেগে যান। তাঁর সমবয়সী কিছু বান্ধবীও পান। অবসর সময়ে তিনি তাঁদের পাণ্ডবাণী শোনাতেন। এভাবেই ভূষণ নামক এক সম্পন্ন ভদ্রলোকের নজরে আসেন তিনি। সেই ভদ্রলোক তাঁর গান শুনে তাঁকে দশ টাকা উপহার দেন এবং তিনিই গ্রামের 'শক্তি চৌরাহা' (শক্তি মন্দির)-তে জনসমক্ষে তাঁর শৈলী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

এভাবেই ধীরে ধীরে গ্রামের নানা প্রান্তে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তীজন বাঈ দাদুর কাছে যে মহাভারত শুনেছিলেন সেটি ছিল ছত্তিশগঢ়ী ধারার হিন্দিতে লেখা, রচয়িতা সব্বল সিং চৌহান। দোঁহা-চৌপদী ধরনের লেখা এটি। দাদুর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর নিজেকে আরও চর্চিত করার জন্য উমেদ সিং দেশমুখের কাছেও প্রশিক্ষণ নেন। আদিবাসী, নিম্নবর্গের অন্তর্গত হয়ে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, উচ্চবর্ণের চোখরাঙানির তোয়াক্কা না করে ধর্মকথা শুনিয়েছেন তিনি। সমাজের বদ্ধ মানসিকতার বেড়াজাল ছিঁড়ে দিয়ে মঞ্চে উঠে আপামর জনতাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন মহাভারতের দ্বৈপায়নে। দেশজ লোকঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্ব অন্দরমহলে— এসব কারণেই কি শুধু এক হার-না-মানা মহিলা বলে তাঁকে আমরা খ্যাতির শীর্ষে স্থান দেব। না, এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তাঁর শৈল্পিক জাদু, অপূর্ব দক্ষতা যা এক মায়াজাল বিস্তার করে দেয়। সেই সম্মোহন কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। পাণ্ডবাণীকে উচ্চতর মাত্রায় নিয়ে গেছেন তিনি। এই পাণ্ডবাণী আসলে কি - ছত্তিশগঢ়ের ভাষা অনুযায়ী পাণ্ডবদের কথা। মহাভারতের ঘটনা কথকতা করে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করার এক বহু প্রাচীন লোকশৈলী এটি। অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশই ছিল মূলত এর জন্মস্থান, তবে উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশেও এর প্রচলন দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই এই আঙ্গিকে দক্ষিণভারতীয় 'হরিকথা' বা 'হরীপাঠ' বা 'হরিকথা কালক্ষেপম্'-এর ছায়াপাত লক্ষ্য করেন। এটি নৃত্য-গীত-সংলাপ-বাদন সমন্বিত এক লৌকিক নাট্যআঙ্গিক যা পুরাণ, মহাকাব্যের কাহিনির উপর আধারিত। পাণ্ডবাণীতেও কথন - নৃত্য - অঙ্গভঙ্গি - মুখভঙ্গি - গীত - দর্শকদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় - দোহারদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তর, প্রত্যুত্তর - বিদ্রূপ - তর্ক সহযোগে নির্দিষ্ট অংশ পাঠ ও তার ব্যাখ্যা চলে। তবে পাণ্ডবাণীর আত্মা কেবলমাত্র মহাভারতের গল্প। মহাভারতের নানা পর্ব, পর্বের অন্তর্গত ছোট ছোট অংশ, এগুলিই উপস্থাপিত হয় এবং এই শৈলীতে মধ্যম পাণ্ডব ভীমকেই মূলনায়ক হিসেবে দেখা হয়।

পাণ্ডবাণীর দুটি ভাগ - একটি বেদমতী শৈলী, যেখানে গায়েন-দোহার সহযোগে মূল শিল্পী মঞ্চে বসে 'প্রসঙ্গ' ব্যাখ্যা করেন, গান ও সংলাপের মাধ্যমে। অপরটি কাপালিক শৈলী, দাঁড়িয়ে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে 'প্রসঙ্গ' অভিনয় করা হয়। এর মধ্যে কথকতা, স্থানীয় ভাষা-শব্দও যুক্ত হতে পারে।[৩] অনেকেই মনে করেন 'কল্পনা' শব্দ থেকে এই 'কাপালিক' শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ মহাভারতীয় চরিত্ররা কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে আচরণ করেছিলেন তা এই আঙ্গিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। সেই সঙ্গে থাকে স্থানীয় লোকবিশ্বাস ও ঘটনা যা পাণ্ডবাণীর প্রস্তুতি ও পরিবেশনে প্রভাব ফেলে।[৪] এই প্রকার শৈলী উপস্থাপনে অনেক বেশি উদ্দীপনা, শক্তির দরকার হয়। তীজন বাঈ হলেন সেই প্রথম মহিলা যিনি শুধু পাণ্ডবাণী জগতে পদার্পণ করেছেন এমন নন তিনি এই পুরুষালি কাপালিক শৈলীতে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।[৫] ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ড, মস্কো, তুরস্ক, জার্মানি, জাপান, ইটালি, ব্রিটেন, তিউনিশিয়া, মাল্টা - বিশ্বের সর্বত্র ভারতীয় এক ঐতিহ্যকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মহাভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্য, দেশের সংস্কৃতি সব কিছু বজায় রেখেই তিনি কাহিনি উপস্থাপনের সময় নিজস্ব পর্যবেক্ষণের সংযোজন ঘটান।[৬] জাপানের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কলাক্ষেত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 'ফুকুওকা', ২০১৮ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখনো পর্যন্ত মোট বারো জন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব এই সম্মান পেয়েছেন, যাঁদের মধ্যে তীজন বাঈ অন্যতমা।[৭] বিখ্যাত

ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট তাঁকে সম্মাননীয় পদ প্রদান করে, সেখানে তিনি তিরিশ বছর কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৮-তে 'পদ্মশ্রী', ১৯৯৫-তে 'সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার', ২০০৩ সালে বিলাসপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'ডি.লিট.' সম্মান, ২০০৩ সালেই 'পদ্মভূষণ', ২০১৬ সালে 'এম. এস. শুভলক্ষ্মী শতবর্ষ পুরস্কার', ২০১৯-এ 'পদ্মবিভূষণ' - পুরস্কারের এই তালিকা সত্যিই চমকে দেওয়ার মতো। একজন নিরক্ষর মহিলা জাতীয়, আন্তর্জাতিক স্তরের সেরার সেরা সম্মান পাচ্ছেন। এই দেখে আজ তারা বাহবা দেয়, মাতৃভূমি ছত্তিশগঢ় বিশ্বের দরবারে গৌরবের সঙ্গে আসীন ভেবে তারা তীজনকে নিয়ে আবেগে আপ্লুত - যারা একদিন তাঁর হাত-পা বেঁধে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সর্বংসহা তীজন দয়াময়ী। কারোর উপর ক্ষোভ নেই তাঁর। যে পরিবার তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকেই আগলে রেখেছেন আজও। তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত বাবা-মায়ের দেখভাল করেছেন। নিজ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন নি। তিনি ভরসা রাখেন ঈশ্বরের কৃপায়। সবই ঈশ্বর নির্দিষ্ট, সেইজন্যই তিনি নিরক্ষর। যদি শিক্ষিত হতেন তাহলে হয়তো তীজন বাঈ হয়ে ওঠা হতো না। দুঃখ-যন্ত্রণাময় দিনগুলিকে আজও স্মরণে রাখেন কারণ সেগুলি থেকেই চালিকা শক্তি সংগ্রহ করেছেন[৮] ও প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছেন, এমনি নিরহঙ্কার,মাটির মানুষ হলেন তীজন বাঈ। নিজস্ব শৈল্পিকসত্তা সম্পর্কেও তিনি এমনই বিনয়ী। তাঁর যে ধুয়াধার বা দোহার বা বাদন শিল্পীরা থাকেন তাদের সম্পর্কে তাঁর একটি কথাই বারবার প্রকাশ পায় যে, তাঁরাই তীজনের সুর-তালের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নেন। কারণ তিনি নিজে তো কোনদিন মেলাতে পারেন নি। সবটাই ওদের কৃতিত্ব। ঢোল, তবলা, মঞ্জীরা, হারমোনিয়াম, করতাল বাদক বিশরাম সিং, সাফিম দাস, কেওয়াল প্রসাদ, নরোত্তমজী প্রায় তিরিশ বছর ধরে তাঁর শিল্প সঙ্গী।[৯]

''দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে
রাখো মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।''[১০]

নমনীয়, কমনীয়, প্রেমময়ী হিসেবে নারী চিরজীবন পুরুষের পত্রপুটে থাকে, গতে বাঁধা এই মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপক্ষে গিয়ে দেখা দেয় যোদ্ধ চিত্রাঙ্গদা। নিজের জীবন দিয়ে সে বুঝিয়ে দেয় কোনো অংশে সে অর্জুনের চেয়ে কম নয়। তীজন বাঈয়ের শৈল্পিক শৌর্যও এই কথা প্রমাণ করে দেয়, 'নহি সামান্যা নারী'। অসংখ্য পুরুষের তির্যক মন্তব্য শুনে শুনেই নিজ লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া তীজন বাঈ জীবনে এমন এক পুরুষের সাহচর্য পেয়েছিলেন যাঁর মাধ্যমে তাঁর শিল্প, শিল্পীসত্তা জাতীয় স্তরে মর্যাদা পায়। মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব হাবিব তনবীর এই অসামান্যা নারীর প্রতিভাকে চিনতে পেরেছিলেন। নিজের বহু

নাটকে প্রয়োগও করেছেন এই শৈলী।[১১] মানুষ এই নাটকের মধ্য দিয়ে নতুন ঘরানা ও তাঁর শিল্পীকে চিনতে পারলো। এরপর দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে তিনি পাণ্ডবাণী উপস্থাপন করেন এবং দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তাঁর প্রতিভা। বিখ্যাত পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার শ্যাম বেনেগাল জওহরলাল নেহেরুর 'Discovery of India' অবলম্বনে ১৯৮৮-তে তৈরি করেন 'ভারত এক খোঁজ', এখানে তিনি তীজন বাঈকে দিয়ে অভিনয় করান। তিনি তীজন বাঈকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অবহেলা নয়, সম মান তাঁর প্রতি ছিল বলেই এই বিখ্যাত মানুষেরা এই কষ্টিপাথরটি খুঁজে পেয়েছিলেন।

তীজন বাঈয়ের বিশেষত্ব ছিল উপস্থাপন আঙ্গিকে। আধুনিক মানুষ যেখানে প্রতিনিয়ত নিজস্ব ঐতিহ্য ভুলে বাহ্য সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে চলেছে, সেখানে তীজন বাঈ যখন মঞ্চে ওঠেন আনখশির তিনি নিজের সংস্কৃতি-পরম্পরা বহন করেন। শাড়ি পরার ধরন, অলংকার, সাজসজ্জা পুরোপুরি ছত্তিশগঢ়ী রীতির প্রতিফলন ঘটায়। তীজন বাঈ মানেই উজ্জ্বল রঙিন শাড়ি, সুদীর্ঘ বেণী, গাঢ় কাজলে অঙ্কিত চোখ, লাল ঠোঁট, বড় লাল টিপ, কমলা সিঁদুরে রঞ্জিত সিঁথি, উজ্জ্বল পাড়ের কোমরবন্ধ, রূপোর দেশওয়ালি গয়না এবং পান খাওয়া[১২] আর একহাতে তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত লাল তানপুরা, যার মাথায় রয়েছে ময়ূর পালক ও রঙ-বেরঙের ফুল এবং অন্য হাতে তানপুরা বাজানোর চাবি। এই তানপুরা আমাদের পরিচিত তানপুরার সঙ্গে মেলে না। এক হাতে বহন করা করা যায় এমন ভাবেই তৈরি। বলা যেতে পারে তীজন বাঈয়ের নিজস্ব পরিচয় এটি। তাঁর মতে এই তানপুরার সঙ্গে মিশে রয়েছে তিন ভগবানের আশীর্বাদ। তানপুরের তিনটে তার মা সরস্বতীর সমার্থক, ময়ূর পালক শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক ও তারহীন বাদ্যযন্ত্রটি হনুমানজী-র গদা। তানপুরাটি সময় অনুযায়ী গীত ও কথকতার মাঝে এক অসাধারণ ভঙ্গিতে তিনি বাজান। এছাড়াও পাণ্ডবাণীতে এই তানপুরার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রথাগত থিয়েটারে 'Prop' (থিয়েটারে ব্যবহৃত জিনিসপত্র) বলতে যা বোঝায় পাণ্ডবাণীতে (বিশেষত কাপালিক শৈলীতে) তানপুরার ভূমিকা সেটিই। এটি কখনো হয়ে ওঠে কৃষ্ণ বা কর্ণের রথ, কখনো অর্জুনের ধনুক, কখনো ভীমের গদা, কখনো দ্রৌপদীর উন্মুক্ত কেশরাজি[১৩] কখনো বা নানা প্রকার অস্ত্র, যেমন - তরবারি, ত্রিশূল, মুগুর, তীর, বজ্র প্রভৃতি। অভিব্যক্তির নানা রূপ ফুটিয়ে তোলে তীজনের তানপুরা - ''বোল্ দেব বিন্দাবন বিহারী লাল কি জয়'' বলে সরস্বতী বন্দনার পরই এই তানপুরা সহযোগে তীজন মহাভারতীয় পরিবেশ তৈরি করে দেন। তাঁর অসামান্য অভিব্যক্তি প্রকাশ ক্ষমতার গুণে পুরুষ, নারী সব চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে জেগে ওঠে।[১৪] দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, গদাযুদ্ধ, কর্ণবধ, দুঃশাসন বধ, অভিমন্যু বধ - এগুলি তাঁর অতি প্রিয় 'প্রসঙ্গ'। লক্ষণীয় যে, এই অংশগুলির মধ্য দিয়ে অন্যায়, অনাচার ও তার ফল সম্পর্কে গভীর ভাবনা প্রকাশের অবকাশ রয়েছে।

ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য লোকনাট্য শৈলী, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের উপস্থিতি দেখা যায় না। গুজরাটের 'ভাওয়াই', রাজস্থানের 'খ্যাল', উত্তরপ্রদেশের 'রামলীলা', 'রাসলীলা', পাঞ্জাবের 'নকল', কাশ্মীরের 'ভান্ড পাথের', হরিয়ানার 'সাঙ্গ', কেরালার 'কৃষ্ণাট্টম্', কর্ণাটকের 'দোভ্ভাট', তামিলনাড়ুর 'থেরুকুট্টু', মধ্যপ্রদেশের 'মাচ', বিহারের 'বিদ্যাপত নাচ', 'বিদেশীয়া', পশ্চিমবঙ্গের 'আলকাপ', 'গম্ভীরা' 'গাজন' - এই দীর্ঘ তালিকার লোকনাট্য আঙ্গিকগুলি একেবারে নারীবর্জিত। ভারতের বৈচিত্র্যময়

এই সংস্কৃতির আঙিনায় নানা সময়, নানা কারণ দেখিয়ে নারীদের প্রবেশ রোধ করা রয়েছে। আজকের সমান অধিকারের যুগে বড়োই বিসদৃশ লাগে এই ভাবনা। অথচ এরই পাশাপাশি রয়েছে স্বল্প কিছু লোকনাট্য যেখানে নারীদের সমান মর্যাদায় নেওয়া হয় ঃ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারের কিছু স্থানে পরিবেশিত হওয়া 'নৌটঙ্কী', অসমের 'আপী ওজা', অন্ধ্রপ্রদেশের 'বুর্‌রা কথা', মহারাষ্ট্রের 'তামাশা', কেরালার 'কুট্টিয়াট্টম', কর্ণাটকের 'যক্ষগান', পশ্চিমবঙ্গের 'নাচনী' - নারীদের বলিষ্ঠ শিল্পসত্তায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এইসমস্ত ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেন তীজন বাঈ। অন্য কোনও আঙ্গিকের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য নেই, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

নারীদের উপস্থিতি যেসব নাট্যে রয়েছে সেই লোকনাট্যগুলির পরিবেশন রীতিতে নৃত্য-গীত-সংলাপ-বাদ্য সমন্বিত অভিনয় দেখা যায়। 'কুট্টিয়াট্টম' ও 'যক্ষগান'-এ সংস্কৃত নাট্য ভাবনা খুবই স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়, এর সঙ্গে অভিনেতারা লোক উপাদান যুক্ত করেন। শ্লোক মিশ্রিত উচ্চাঙ্গ গীত, নৃত্য এবং শরীরী বিভিন্ন মুদ্রার প্রয়োগ ও মূকাভিনয় হল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই ধারার। বিশেষ ধরনের পোশাক ও রূপসজ্জা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অভিনয়ের সময়। কথকতাধর্মী কিছু ধারার উল্লেখ করা যায় এর সঙ্গেই। কীর্তন, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় 'পাঠ' (অধিকাংশ স্থানে বসে, কখনো দাঁড়িয়ে), তার সঙ্গে সঙ্গত করে বাদ্যযন্ত্র ও বাগ্‌যন্ত্রের উত্থানপতন অনুযায়ী মৌখিক অভিনয় (সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় না)। পান্ডবাণীর 'বেদমতী শৈলী'-তেই বসে অভিনয় করা হয়। এই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে তীজন বাঈ প্রস্তুত করেন অভিনব আঙ্গিকটি। একদা পুরুষ অধিকৃত 'কাপালিক শৈলী'র পান্ডবাণীতে আবালবৃদ্ধবনিতার চরিত্রে এককভাবে পাঠ সহযোগে শরীরী ভঙ্গিমায়, হাতে থাকা তানপুরাকেও সহচরিত্র করে তুলে, ধুয়াধারদের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান কুরু-পাণ্ডবদের জীবনগাথা, যা 'স্থানীয় লোকগীতি ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সাহায্যে'[১৫] এক অনবদ্য রূপ লাভ করে। সংস্কৃতের গাম্ভীর্যের পরিবর্তে সম্পূর্ণ দেশজ স্পর্শে পুরাণ ও সমকাল এক হয়ে ওঠে তীজনের কণ্ঠে। বিশ্বদরবারে একজন নারী হয়ে ওঠেন একটি শৈলীর অপর নাম।

তেরো বছর বয়স থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজও বহমান। বার্ধক্য এসে কড়া নাড়লেও রেওয়াজ কখনো থামে না। কম-বেশি প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রীকে তিনি তালিম দিয়েছেন। তারা দক্ষ ভাবেই বিভিন্ন জায়গায় এই লোকজ কলা উপস্থাপন করে চলেছেন। আমাদের কলকাতাতেও রয়েছেন এমন একজন মানুষ। বিখ্যাত একটি থিয়েটার দল 'কসবা অর্ঘ্য'-র প্রতিষ্ঠাতা মনীশ মিত্রের স্ত্রী সীমা ঘোষ, তীজন বাঈয়ের শিষ্যা। তিনি বছরের পর বছর তাঁর কাছে থেকে এই শৈলীতে পারদর্শী হয়েছেন। এখন সগর্বে বাঈয়ের ঐতিহ্যের পতাকা বহন করছেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তীজন বাঈয়ের সন্তান-সন্ততিরা কেউই এই শিল্পে আগ্রহী নয়। লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচার তিনি আজও করেন গানের মধ্য দিয়ে। যাঁদের সাহচর্যে আজ তিনি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন তাঁদের সকলের প্রতিই তিনি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন প্রতিনিয়ত। মাটির মেয়ে মাটির প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেই চলেছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি কথাই তিনি বারবার বলেন যে, নিজ ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করে তার জন্য জীবনপণ

করতে হবে, অসীম ধৈর্য রাখতে হবে। তবেই আসবে মানসিক শান্তি ও সফলতা। তাঁর এই অসাধারণ দক্ষতার প্রভাব বাংলা থিয়েটারেও রয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে। বাংলার আরও এক কৃতী নারী - শাঁওলী মিত্র তাঁর 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকে রেখেছিলেন তীজন বাঈয়ের পাণ্ডবাণীর কথন শৈলী - ''গল্প বলতে বলতে কখনো সে উত্তেজিত হয়, কখনো সে ব্যঙ্গ করে, কখনো বা একটা কাহিনীর পিছনে সম্ভাব্য যুক্তি বা ব্যাখ্যা উপস্থিত করে, কখনো সে গায়, কখনো সে নাচে - সবই তার অনুভবগুলো প্রকাশ করার তাগিদে"।[১৬] বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অপর এক নারী বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, তিনিও তাঁর মহাভারত কেন্দ্রিক একক মঞ্চ উপস্থাপনায় পাণ্ডবাণী শৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তীজন বাঈ বোধহয় প্রথম এমন এক (মহিলা) শিল্পী যিনি নিজস্ব ঘরানা প্রস্তুত করেছেন যা শিল্পের নানা প্রাঙ্গণে সগর্বে বিস্তৃত হয়েছে। 'মহিলা' শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে রাখার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, পুরুষ অধিকৃত পাণ্ডবাণী শিল্প ক্ষেত্রে তীজন বাঈ প্রথম মহিলা যিনি অত্যাচার ও অপমানের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে নিজ আদর্শে স্থির ছিলেন। একজন নারী হয়ে অপর এক নারীর এই লড়াইয়ের জন্য গর্বিত, অহংকৃত আমি। সেই কারণে 'মহিলা' শব্দের উল্লেখ। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, শিল্পীর কোন লিঙ্গগত পরিচয় হয় না। শিল্পী, শিল্পীই হন। প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মের ফর্ম পূরণে থাকে পুরুষ, নারী, তৃতীয় লিঙ্গ-এর মতো বিভেদ; শিল্পের ক্ষেত্রে হতে তা পারে না কখনোই।

তীজন বাঈ - এক অনন্য শিল্পসত্তা। সমগ্র বিশ্বে এমন বহু নারী রয়েছেন যারা নানা রকম কাজের সঙ্গে যুক্ত। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা আজ সসম্মানে উত্তীর্ণ। মাটি থেকে আকাশ, সকল ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি সমাজ-সংসারকে উন্নত হতে সাহায্য করেছে। নারীদের এই অবদানের তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে পাতার পর পাতা জুড়ে তা লিপিবদ্ধ হবে। বর্তমানে নারী কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। কেউ কেউ প্রতিষ্ঠার আলোকে আসতে পারেন। আবার কেউ থেকে যান সেই আলোর উল্টো পিঠেই কিন্তু যিনি বিপরীতে থাকলেন তার অবদানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একসময় নারীর অবস্থা ছিল এমন - ''যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনিই ধর্ম্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে"।[১৭] এই অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতি এখনো হয়নি ঠিকই তবে প্রগতিশীল সমাজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, নারীই সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী। বহু সংঘর্ষ করে নারী আজ 'আপন ভাগ্য' জয় করার অধিকার অর্জন করে নিয়েছে। 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন' প্রাণ পণ করে তীজন জিতে নিয়েছেন। তীজন বাঈয়ের জীবনের এই সংগ্রাম নারীর অধিকার অর্জন ও রক্ষার লড়াইকে বহু অংশে সাহস জুগিয়েছে এবং আজও সেই সাহস তিনি দিয়ে চলেছেন। একাগ্র চিত্তে নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকার অনমনীয়, আপোষহীন সংগ্রামেরই অপর নাম - তীজন বাঈ।

তথ্যসূত্র :

১। মণ্ডল, তপন। ''মুক্তধারা - পাঠকের ভাবনায়"। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, পৃঃ ১০।

২। S. Bagesshree. "Pandavani in Paris". The Hindu, 26 June 2005, p. 4.

৩। https://www.paramparaproject.org/traditions_gammat-theatre.htm

৪। দাস, ধ্রুব। ভারতের লোকনাট্য। কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিকেশন, ১৩৬৭, পৃঃ ২৬০।

৫। Kumar, Ranee. “Songs of Wishdom”, The Hindu, 13 December 2004, p. 5.

৬। তদেব।

৭। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fukuoka_prize

৮। Kumar, Ranee. “Songs of Wishdom”, The Hindu, 13 December 2004, p. 5.

৯। https://m.tribuneindia.com/2002/20021116/cth2.htm

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৮৬, পৃঃ ২৪১।

১১। S. bagesshree. “Pandavani in Paris”. The Hindu, 26 June 2005, p. 4

১২। Ranganathan, H.K.. Katha-Kirtan. India: India International Center Quarterly, 1983, P. 199-20.

১৩। https://banglalive.com/teejanbai-an-exponent-of-pandavani-a-rural-form-of-performing-arts/

১৪। https://m.tribuneindia.com/2002/20021116/cth2.htm

১৫। দাস, ধ্রুব। ভারতের লোকনাট্য। কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিকেশন, ১৩৬৭, পৃঃ ২৫৯।

১৬। মিত্র, শাঁওলী। নাথবতী অনাথবৎ। কলকাতা : এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬. পৃঃ ১৩।

১৭। রোকেয়া, বেগম। রোকেয়া রচনাবলী। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৬, পৃঃ ৫৯৩।